Vol. 4 | No. 2 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ

Volume	4
Issue	2
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i2.5
Pages	255-300
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ

মুহম্মদ আবদুল হাই

[এক]

বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবতত্ত্ব

ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল মোটামুটি ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার প্রদত্ত তারিখ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার বহু যুক্তি রহিয়াছে। এই হিসাবমতে বিদ্যাপতি মোটামুটি এক শতাব্দী বাঁচিয়া ছিলেন। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলাবাসী এবং মৈথিল ভাষাতেই কাব্য-সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বিহারের কামেশ্বর রাজবংশের রাজসভা কবি হিসাবে তাহাদের উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি একাধারে বহু ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, ন্যায়, স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখিতেন এবং অলঙ্কার ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষ-পরীক্ষা, কীর্তি-পতাকা, লিখনাবলী, শৈব-সর্বস্ব, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বিচিত্র বিষয়াভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা তাঁহার পাণ্ডিত্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তিনি সেকালের বিহারের বা পূর্ব-ভারতের নয়, সমগ্র ভারতেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। দেহজীবী প্রেমের কবি হিসাবে তিনি কালিদাস এবং জয়দেবের সগোত্র এবং মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

সেকালের মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির লীলাভূমি। বাংলা দেশ হইতে ছাত্রেরা সেখানে পড়িতে যাইত। তাহারই সমসূত্রে মৈথিল অর্থাৎ সেখানকার দেশী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির গান ও কাব্যে তাহারা আকৃষ্ট হইত। তা'ছাড়া বাংলার সহিত তদানীন্তন মৈথিল ভাষার পার্থক্যও ছিল কম। ফলে বিহারী কবি বিদ্যাপতি সংগীতপ্রিয় বাঙ্গালীচিত্তকে আকৃষ্ট

করিলেন। কালে বাংলাদেশেই বিদ্যাপতির কাব্য বেশী সমাদর লাভ করিল। তাহারও কারণ ছিল।

ধর্মমতের দিক দিয়া বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। ছিলেন শৈব বা (শাক্ত)। তবু তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। হৃদয়ের আর্তিতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতেও তাহা ছিল সমৃদ্ধ। সে কারণে চৈতন্যদেবও তাঁহার পদাবলীকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু বিদ্যাপতির পদাবলী শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতেন তাহা নহে, ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তাঁহার পদাবলীর আস্বাদনও করিতেন। ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে। এদেশে বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা এত বাড়িয়াছিল যে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী বিদ্যাপতি তথা কবিশেখর কবিরঞ্জন প্রভৃতি 'ছোটো' বিদ্যাপতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা তাঁহার ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাছাড়া সরাসরি বৈষ্ণব না হইয়াও কল্পনাবশে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মান অভিমান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ও মিলন বিরহ প্রভৃতি সম্ভোগাত্মক কাঠামোর ভিতর দিয়া তিনি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কাব্যের গতিপ্রকৃতিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। পারিপার্শ্বিক জীবন ও অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবু রাধা ও কৃষ্ণ তাঁহার কাব্যের প্রধান অবলম্বন হওয়ায় সাধারণ মানব-মানবীর জীবনবাণী ও জীবনানুভূতিকে ছাপাইয়া শেষ পর্যন্ত সেখানে আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এজন্যে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকলেরই প্রিয় কবি। তবু বিদ্যাপতি সাধারণ্যে বৈষ্ণব কবি হিসাবে পরিচিত এবং তাঁহার কাব্য বৈষ্ণব তত্ত্বভিত্তিক—অন্য কথায় বৈষ্ণবকাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা—বলিয়া উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে।

ভক্তিই বৈষ্ণব তত্ত্বের আধার। সেদিক দিয়া বিষ্ণুর ভক্তমাত্রই বৈষ্ণব। কর্মকাণ্ডপ্রধান বৈদিক যুগে ভক্তিধর্মের ব্যাপক প্রসার না দেখা গেলেও সেকালেই ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কালক্রমে শঙ্করাচার্য (অষ্টম শতাব্দী), রামানুজ (একাদশ শতাব্দী), মধ্বাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী), নিম্বার্ক (পঞ্চদশ শতাব্দী), বল্লভাচার্য (পঞ্চদশ শতাব্দী) প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারদের

হাতে ভক্তিধর্ম নবতর ব্যাখ্যালাভ করে। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) 'ভক্তিবাদীদের ভাষ্যকে উন্নত করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।' চৈতন্যপ্রবর্তিত এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি।

বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের মূলকথা এই যে, বিশ্বের পরমপুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়াও ভিন্ন নহে। সৃষ্টির সহিত তাঁহার নিত্য সম্পর্ক। এই কথাটিই রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাধা সৃষ্টির এবং কৃষ্ণ পরমপুরুষের প্রতীক। রাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণ রাধা হইতে স্বতন্ত্র, অথচ তাঁহারই অভিন্ন সত্তার নিকট হইতে আনন্দলাভ করিতেছেন।

রাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া বাহ্যতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া হইলেও মূলতঃ তাহা নহেন। এবং তাঁহাদের সম্পর্কও কামভাবহীন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে বৈষ্ণবেরা কাম বলিয়া বুঝিয়াছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে বলিয়াছেন প্রেম। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার বা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির অপরিমেয় প্রেমময় মনোভাবকেই প্রকাশ করিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের প্রধান—এবং সে কারণে বৈষ্ণব কাব্য শাখারও প্রধান—অংশ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও তাহার অনুকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই অনুকৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রাক-চৈতন্য যুগের প্রধান কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হিসাবে সংস্কৃত ভাষায় কান্ত কোমলপদ সমন্বিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার কাব্যসাধনা করিয়াছিলেন মৈথিল ভাষাতে। আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য মধ্যযুগের আদিমতম বাংলার নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। যে বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভাষ্য তাহা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কাব্যের এই যে অসাধারণ সমৃদ্ধি প্রাক-চৈতন্যযুগে বিদ্যাপতির কাব্যেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

[দুই]

ইসলাম ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম

বাংলা দেশ অনুকরণপ্রিয়। ইসলাম প্রবর্তিত মানবতার ও নূতন সমাজ ব্যবস্থার আকর্ষণে বাংলা দেশও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলা দেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের যুগে সেকালের বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে উৎপীড়িত হইয়াছিল, এ দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম আসিয়াছিল বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। সেইজন্য সেকালে অগণিত বাঙালী বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম সুফী সাধকেরা ইসলামের তাওহীদবাদ এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারার্থে দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং মালাবার উপকূলে বসবাস করিতে শুরু করেন। তার ফলে সেখানকার লোক মুসলমান হইয়া যায়। নবম শতাব্দীর শুরুতেই মালাবারের চেরামন পেরুমল বংশীয় শেষ নরপতি ইসলামধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া মক্কা চলিয়া যান। * হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে বহিরাগত এই উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য সেকালে ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামীদের মতে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল, এতকাল পরে বাংলা দেশ তদপেক্ষাও গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, চৈতন্য তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। তাই ইসলামের হাত হইতে সেকালের বাংলাদেশকে বাঁচাইবার জন্য ইসলামেরই মূলমন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' — এই বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া তিনি রামানুজ না নিম্বার্কের শিষ্য সুস্পষ্ট না বুঝা গেলেও ইসলামের নির্যাস আত্মসাৎ করিয়া ইসলামকে রোধ করিবার জন্য তিনি যে নিম্বার্কের ভক্তি প্রেম ও আবেগপ্রধান সাধনার পথ বাহিয়া লইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নিম্বার্ক এবং রামানন্দের মধ্যে যে সাধনা ছিল

* Tarachand : Influence of Islam on Indian Culture (Allahabad, 1946), p 33-34.

মূলতঃ আবেগপ্রধান, চৈতন্যের মধ্যে তাহা আবেগসর্বস্ব হইয়া উঠিল। তাঁহার মত, অনুভূতি ও সাধনার রূপায়ণে নৃত্যগীতাদি ও হরিনাম সংকীর্তন তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে শ্রীচৈতন্যের রূপধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসিলেন না। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবকান্তিধারণ করিয়া 'বহিরঙ্গে রাধা' এবং 'অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ' রূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন—

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরূপ আস্বাদিতে হইলে অবতার॥

এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে চৈতন্য একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ দুইই।

বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনধারা ও জাতির মর্মমূলের সঙ্গে চৈতন্যের সুগভীর পরিচয় ছিল। তাঁহার যুগে তাঁহার মতো করিয়া আর কোনো বাঙালী হিন্দু ইসলামে সাম্য, মৈত্রীর ও একত্ববাদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হন নাই। তাই ইসলামের মোকাবিলা করিয়া তাঁহার জাতিকে বাঁচাইবার জন্য এই অবতারতত্ব ও বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির বন্যায় সেদিন তাঁহাকে হিন্দু বাংলাকে ভাসাইবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র নদীয়ায় হরিনাম-সংকীর্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছিলেন তব্‌লীগে বিশ্বাসী। তাই সমগ্র বাংলা দেশ ও বাংলার বাহিরে উত্তর ও মধ্যভারতে তিনি এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা তাঁহার নবলব্ধ বৈষ্ণব ধর্মচেতনার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এই অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল ধারাটি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় অনুভূতির প্রতিরূপ অর্থাৎ রূপক গীতিকাব্য।

[তিন]

বৈষ্ণব অনুভূতি ও সুফী মতবাদ

বৈষ্ণব সম্ভবতঃ বুঝেন যে কোন বৃহৎ ও সার্বজনীন বিষয়বস্তুকে একেবারে আয়ত্তে আনা যায় না। অনন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি চক্ষু জুড়াইয়া

স্পর্শে ; মনেই থাকে না কোথা হইতে আমার অভিলষিত এক ঘটি জল লইব। সেই জল তুলিতে গিয়া আমি আত্মপর ভুলিয়া যাই, আপনহারা হইয়া পড়ি; উদ্দেশ্য প্রথমেই অনির্দেশ্য হইয়া পড়ে। তাই আমার সাধনার আরম্ভ ছোটর ভিতর দিয়া, কারণ সেই ছোটর ভিতরে ছোট তো রহিয়াছেই, অধিকন্তু যেখান হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহা সেই বড়র অংশ বলিয়া বড়ও সেখানে ধৃত হইয়াছে। যেমন একটা ঘট, সেও মাটির অংশ। সুতরাং সেই ঘটাকারে সর্বমৃত্তিকার রূপই প্রত্যক্ষ করি, ঘটাকাশের মধ্যে অনন্ত আকাশের রূপ নিবদ্ধ হয় বলিয়া সেই ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের পরিচয় মিলে। প্রথম সেই ক্ষুদ্রকে তুলিয়া আনি তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়া, সেই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব নষ্ট করিয়া দাও, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেল, তখন তাহা অনন্ত মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইবে, আর ঘটাকাশ বিরাট আকাশের মধ্যে, সেই ভূমার মধ্যে বিলীন হইবে। অনন্ত আকাশের অংশবিশেষ যেমন ঘটাকাশটুকু, তেমনি নির্বিশেষের বিশেষরূপ এই জগৎ, এই সৃষ্টি। স্রষ্টা আনন্দলাভ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া সৃষ্টির কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখনই "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছান্দোগ্যোপনিষদ)। তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। সেই ইচ্ছার প্রকাশ এই সৃষ্টি। স্রষ্টার এই সৃষ্টিকে বৈষ্ণবেরা রাধার কায়ব্যূহরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ক্ষমতার বিচিত্র দিককে আনন্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাঁধিবার জন্য স্রষ্টা যেমন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন বৈষ্ণব ভগবানের সেই সৃষ্টিকে তেমনি রাধিকার 'কায়ব্যূহ' রূপে দেখিয়াছেন। বৈষ্ণবের সুষুপ্ত ব্রহ্মের সুপ্তিভঙ্গই এই সৃষ্টি :—

> কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন, সোনার বরণ পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে—আহ্লাদিনী ভালবাসাঠাকুরাণী, শ্রীরাধা। ঠাকুরাণী বলিলেন, পরাণ বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আমার ষোলকলার এক এক কলা হইতে তোমার জন্য সহস্র প্রণয়িনী সৃষ্টি করিব। আমার অংশে আমার পরিণাম তাহারা, আমার ধাতু আমার স্বভাব পাইবে, তুমি যাহার সহিত সঙ্গত হইয়াই সুখ পাও, তাহারা তাহাতেই অনুকূল হইবে। সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া তোমার ভোগের উপযুক্ত নৈবেদ্য করিয়া তোমার নিকট অভিসার করাইবে।
>
> আমি নন্দমহারাজ হইয়া তোমার জন্যে হাটবাজার করিব এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন পালন ও শাসন করিব। ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব।

বনে তোমাকে ঘন দুগ্ধ পান করাইব; বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধা নাম গাহিব, তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব, তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব, কদম্ব তরু হইব; গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মলয়পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব, অঙ্গ পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব।... নানা ধাতুর বৈচিত্র স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান, লতাবিতানে সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, রাসস্থলী, মরালের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব; তুমি সকল রকম রসের কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না। এইরূপে কৃষ্ণের সকল রকম সুখের উপকরণ-সমষ্টি ব্রজনির্মাণ শেষ হইল। ঠাকুরাণী ব্রজনির্মাণ করিলেন। সমগ্র ব্রজটি ভালবাসা ঠাকুরাণীর কায়াব্যূহ।*

রাধার এই বিরাট কায়ব্যূহ নির্মাণের মূলতত্ত্বের সহিত ক্ষুদ্র ব্যক্তি দেহের তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে আনন্দ নিখিলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাই ধরা দেয় মানুষের এই দেহে। বিশিষ্ট প্রেমিক তাহা আস্বাদ করে এই দেহদ্বারা। বৈষ্ণব কাব্যে তাই আমরা দেখি দেহের প্রাধান্য। মানুষ যখন নিজেকে অন্তরের সঙ্গে মিলাইবার জন্য আপনার দেহকে শুধু উপায়স্বরূপে ব্যবহার করে, বৈষ্ণবের মতে তখন তাহা পবিত্রতা লাভ করে, কিন্তু দেহ যদি উপলক্ষ না হইয়া লক্ষ্যে পর্যবসিত হয় তখন তাহা ঘৃণ্য কামপরিচর্যার আধাররূপে দেখা দেয়। উপলক্ষের মধ্যে কামগন্ধও থাকেনা, রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মসমাহিত হইয়া উঠে। তখন বৈষ্ণব বলিতে পারে 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' ইহা ব্যবহারিক জীবনে সত্য না হইলেও বৈষ্ণবের ভাবানুভূতিতে হয়ত সত্য; তাই তাঁহারা যখন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকে অপরেন্দ্রিয় প্রীতিরূপে অনুভব করেন তখন তাহা হয় প্রেম। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যদি স্বরূপেই রহিয়া যায় তখন তাহা কাম। বৈষ্ণবের রাধা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে এমনই আবেশ বিহ্বলা যে সেখানে নিজেন্দ্রিয় প্রীতির কথা তাঁহার মনেই আসেনা। কৃষ্ণ যদি সুখী হন তাহা হইলে তাঁহার অদেয় কিছু নাই, কৃষ্ণকে তিনি এমনভাবে ভালবাসিয়াছেন, এমনভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পন করিয়াছেন যে কৃষ্ণের সুখ তাঁহার নিজের সুখ, কৃষ্ণের আনন্দ তাঁহার নিজের আনন্দ। বৈষ্ণবের কথায় এই যে প্রীতি তাহা—

* ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঠাকুরাণীর কথা।

পীরিতি পীরিতি কি রীতি মূরতি
পীরিতি বলয়ে তারে
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।

তাই দেখি ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি রাধা বলেন :—

> দর্পণে যখন আমার প্রতিবিম্ব পড়ে তখন সেই প্রতিবিম্বকে যে 'আমি' দেখিতে থাকেন সেই 'আমি' হইলেন আমার ভগবান। প্রতিবিম্ব আমিতে যদি কোথাও দুঃখের ছায়া থাকে, মুখখানা শুষ্ক নীরস ও বিপন্ন থাকে, চোখে যদি জল ঝরে তবে আমার ভগবান যে ব্যথিত হন, তাই আমাকে সাজাইয়া রাখি ; ঠোঁট দুইটিকে করিয়া রাখি লাল টুকটুকে, চোখে দেই কাজল, কপালে দিই তেমনি একটা ঘনকৃষ্ণ তিলক ফোঁটা। মুখে রাখি হাসি প্রস্ফুটিত। যখন ভগবানরূপী আমি আমাকে হাস্যোজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত দেখেন তখন তিনি সুখী হন। তখন তাঁরও মুখে আসে হাসি। তাইত আমার এত বিলাস, তাইত আমার সজ্জা।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখে নিজকে এতটা বিলাইয়া দেওয়ার যে আনন্দ তাহা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের নিজত্বকে ভুলিতে পারে, যখন তার আমিত্ব বলিতে আর কিছুই থাকেনা। যখন তাহার মন ও আত্মা কৃষ্ণময় হইয়া উঠে তখন দেহের মান সম্ভ্রম লজ্জা সঙ্কোচের কথা মনেই পড়ে না। সেই আবেশবিহ্বল অবস্থায় সে বলিতে থাকে আমার সর্বদেহে কৃষ্ণ বিরাজ করুন। তাই কৃষ্ণবিহার স্থল তাহার দেহকে সাজাইতে তাহার কোন বাধা জন্মে না এবং সেই দেহকে তখন সে কলা সমন্বিত করিয়া প্রিয় মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যে এই সজ্জার এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করিবার ও করাইবার যে বহিঃপ্রকাশ আমরা তাহা উক্ত সাহিত্যের 'ভাব সম্মিলন' অংশেই বেশী করিয়া প্রত্যক্ষ করি। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে 'ভাব সম্মিলনে' দেহদানের এই অপূর্ব সমাবেশই বর্ণনার মাধুর্যে এবং প্রকাশের বিশিষ্ট কারুকার্যে একদিকে যেমন ফেনিলোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে তেমনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় রাধিকা হৃদয় আপনাকে ধরা দিয়াছে।

বৈষ্ণব বড় রকমের দেহবাদী। প্রেমের দেউলে সে একান্তভাবে দেহের পূজারী। সে বলে 'অতবড় ভাব লইয়া আমি কি করিব? শুধু আদর্শ লইয়া ত মানুষ বাঁচিতে পারেনা।' আমি চাই হৃদয় দিয়া একেবারে প্রত্যক্ষ করিতে। তাই ভগবানকে ভাবলোকে, আদর্শলোকে প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের অতি সন্নিহিত করিয়া পূজা দিব। ভগবানের লীলা-খেলাকে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে মিলাইয়া সাধারণ নরনারীর প্রেম প্রকাশের ভিতর দিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব।' তাই বৈষ্ণবের কাছে ভগবান হইলেন এক অপূর্ব প্রেমিক নাগর, আর তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি বা আনন্দ বিধায়িনী শক্তি শ্রীরাধা ষোলকলায় বিভূষিতা অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না সাংসারিক নায়িকা।

এই প্রসঙ্গে পারস্য ভাষার সাধক কবিদিগের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদেরও অনেকে যেমন ওমর খাইয়াম, জামী, হাফিজ, সা'দী, শামস্ তবরেজ, আমীর খসরু ও জেবুন্নিসা প্রভৃতি খোদাওন্দের প্রেমোপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকে অনন্ত যৌবনা, রূপসী প্রেয়সী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং আপনাদিগকে সে অদ্ভুত কলাবিলাসিনী রূপসীর সর্বগুণসম্পন্ন নায়করূপে কল্পনা করিয়া। সহজ কথায় বৈষ্ণব কবিতায় পরমাত্মা পুরুষ, জীবাত্মা নারী; আর সুফী কবিদের গযল কবিতায় পরমাত্মা নারী, জীবাত্মা পুরুষ। উভয় কাব্যসাহিত্যেরই মূলভাব প্রেম এবং মাধুর্য।

আমরা জানি, প্রাকৃত প্রতীকের (symbol) সাহায্যে অপ্রাকৃত প্রেমের পরিমাপ নির্দ্ধারণ করিবার যে ভাবনা কোরাণ কিংবা ইসলামের শরা শরীয়ত বা শাস্ত্রাদি তাহা কোনদিনেই সমর্থন করে না। কিন্তু পারস্যের ও তাহাদের অনুগামী ভারতবর্ষীয় সুফী কবিগণ যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিবেক ও শাস্ত্রাদি রচিত সীমারেখার বুদ্ধিজাল ছিন্ন করিয়া শারাব, সাকী, প্রিয়া ও পিয়ালার সাধনায় নিজেদের অন্তরাত্মাকে এমন এক উর্দ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছেন, সেখান হইতে অমৃতলোকের রসাস্বাদন করিতে তাঁহাদের কোন প্রকারের শাস্ত্রানুগ হইতে হয় নাই। আকাশের নীলিমায়, বাতাসের মর্মরধ্বনিতে, সাগরের অসীমতায়, চাঁদের লাবনীতে যে বৈচিত্রময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে, মিলন আশায় সেই আলেয়ার পিছনে জীবনব্যাপী বিরহের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলার যে আনন্দ এবং সেই প্রেমোপলব্ধির যে গভীরতা একান্তভাবে সুফী কবিগণের তাহাই প্রাপ্তি।

সুফী সাধনার ইতিহাসে 'আলামে নাসুত', 'আলামে মালাকুত', 'আলামে জাবারুত' এবং 'আলামে লাহুত' নামক যে চারিটি স্তর রহিয়াছে, তাহার প্রথমটি সেই সাধনপথের যাত্রীকে পার্থিব ভোগলালসার পথ হইতে রক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমোন্নতির পথ নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে জাগতিক লোভ ও মোহমুক্ত মানুষ ঈশ্বরের অপরূপ রূপের দর্শন আশায় অধীর, উদ্‌গ্রীব ও আত্মহারা হইয়া উঠে। তাঁহার দর্শন তখনও সে প্রকৃষ্টভাবে পায় না, অথচ কি যেন কিসের প্রাপ্তির মোহনীয় মাদকতায় উন্মত্তবৎ দিশাহারা হইয়া ফিরে। সুফী সাধনার এই দ্বিতীয় স্তরই অতীব ভয়ানক। উক্ত সাধন-তত্ত্বান্বেষী বহু মানুষ এই স্তরে আসিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় উন্মাদ হইয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে যাঁহাকে পাই পাই করিয়াও পাওয়া গেল না তৃতীয় স্তরে নিখিলের মধ্যে তাঁহারই রূপ বিচ্ছুরিত দেখা যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহারই রূপ অবলোকন করিয়া সুফী সাধক স্বীয় আত্মরতির চরিতার্থতা লাভ করেন। চতুর্থ স্তরে সমগ্র জগতে পরিব্যক্ত সেই অপার্থিব রসমূর্তির নিকটে নিজকে পরিপূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়া উঠেন। সে অবস্থায় ভক্ত সাধক ও 'সাধ্যে' কোন পার্থক্য থাকে না, তখন পূজ্য ও পূজক এক হইয়া যান। অপার্থিব অমৃত রস এমনভাবে আস্বাদন করিবার পরেও সুফী সাধক পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে পারেন এবং জাগতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সকল তথ্য ও সত্যের ধারায়, সংসার জীবনের লোক-লৌকিকতার মধ্যে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল ও কঠোর গুণাবলীর আদান-প্রদানে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিজেকে নিয়োগ করিতে পারেন। সুফী-মতবাদ, দর্শন ও সাধনার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বেদান্ত দর্শনে জীবাত্মা যেখানে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, বৈষ্ণব দর্শনে জীবাত্মা পরমাত্মায় একেবারে বিলীন না হইয়া গিয়া সেখানে 'তদ্ভাবে' থাকে, সুফী মতবাদ সেখানে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সংগে মিশাইয়া তাহাকে অপার্থিব দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ও সুপুষ্ট করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরাইয়া আনে এবং জগতের সকল বন্ধনের মধ্যে অসম্পৃক্তভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা দান করে।

সুফী কবিগণ অপার্থিব প্রেমের পার্থিব রূপ রচনা করিয়া আজীবন বিপুল দুঃখর গহীনতায় যেখানে চির সুখের পরিসমাপ্তি চাহেন, বৈষ্ণব কবিগণ

সেই অপার্থিব সত্তাকে পার্থিব রূপের বাঁধনে বাঁধিয়া হৃদয়ের অতি সন্নিহিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পার্থিব নিয়মের বিভিন্ন ধারায় আপন হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কাব্যে বৈষ্ণবের এই যে অনুভূতির প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহা—

এই প্রেমগীতি হায়
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
দিই তাই দেবতারে। আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া যে ভক্তি-প্রীতির বান ডাকিয়াছিল, তাহা ভারতীয় হিন্দু দর্শন হইতে উদ্ভূত; শুধু তাহা কবীর দাদূ প্রমুখ সাধকের সাধনায় ইসলামের সুফী মতবাদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সময়ে নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে। সে কালের দেশব্যাপী সাধনার স্থায়ী স্বাক্ষর এই বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্য। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা তথা ভগবান ও তাঁহার আনন্দবিধায়িনী শক্তির এই কেলিকলাকে একেবারে মানব-মানবীয় প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত করিয়া মর্ত্য জীবনের মাধুরী পান করিতে চাহিয়াছেন। সেই সাধনায় প্রাক্-চৈতন্য যুগে তাহাদের ভগবান হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা হইয়াছেন একেবারে সদ্বংশজাত কোন বঙ্গীয় কুলবালা; আর চৈতন্য পরবর্তী যুগে ক্ষেত্রবিশেষে কবিদিগের আপনাপন হৃদয়ই শ্রীরাধার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ আপন হৃদয়কে রাধারূপে কল্পনা করিয়া ভগবানের চরণতলে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সেই ভগবানকে সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য, কান্ত বা মধুরভাবে সেবা করিয়াছেন। অন্যান্য ভাবের তুলনায় কান্ত বা স্বামীভাবে ভগবানকে পূজাদান বৈষ্ণব কাব্যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদের কাব্যে নায়িকাকে পূর্বরাগ, প্রেম-অভিসার, মিলন-বিরহ, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি স্তরে আপন হৃদয়ের রসমাধুর্য নিবেদন করিতে দেখিতে পাই।

বৈষ্ণবের এই যে কান্ত স্বামীভাবে ভগবানকে পূজাদান ইহার মধ্যে আবার একান্তভাবে পরকীয়াবাদেরই প্রাধান্য। গতানুগতিক সংসার বন্ধনে

প্রেমের স্বাতন্ত্র্য তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবের ন্যায়। সেখানে প্রেমের ঔজ্জ্বল্য তেমন অনুভূত হয় না—অনেকটা বৈচিত্র্যের অভাবে আর অনেকটা নিতান্ত ধরাবাঁধা নিয়মানুবর্তী বলিয়া। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যগ্রা থাকিয়াও অন্তরে সর্বদা উপপতির কথা চিন্তা করে, তেমনই আমরা যদি এই বিশ্বে বাস করিয়া, সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও সর্বদা বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে তো আমাদের কূল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পদাবলী পরিচয়, পৃ ১৫০।) বৈষ্ণবের শ্রীরাধাও এমনি দ্বিচারিণী নায়িকা। লৌকিক বিশ্বাস—তিনি আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং কূলে কলঙ্ক দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নিজকে ধন্য করিয়াছিলেন। গূঢ়তর অর্থে বৈষ্ণবের এই শ্রীরাধা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি—জীবাত্মার বা মানবাত্মার প্রতিমূর্তি। মানুষ সংসারে আসিয়া সাংসারিক লাভ ক্ষতি, লোভ-লালসা এবং ভোগবিলাসে এমনই আবিষ্ট হইয়া পড়ে যে এই সংসারের দাসত্ব করিতেই তাহার জীবন ব্যয়িত হইয়া যায়। সেখানে ধর্ম বা ভগবান বলিয়া কোন শ্রেষ্ঠতর চেতনা সাধারণতঃ স্থান পায় না। আবার সংসারী মানুষের ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সাংসারিক আচার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া এরকম মানুষ হয় ভুল করিয়া বসে, না হয় সম্পূর্ণ অপারগ হয়। অমৃত লোকের রসাস্বাদনের আকর্ষণে মানবাত্মার এই পরিণতি বিচিত্র নহে।

সংসারে থাকিয়া যে মানবাত্মা ভগবানের ডাকে সাড়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসেন তিনি বৈষ্ণবের চোখে পরকীয়া নায়িকা এই শ্রীরাধা। এই সংসার যমুনায় নিত্যকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। তুমি আমি আর সে ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি না, কিন্তু যে রাধারূপী হৃদয় সে আহ্বানে একবার সাড়া দিল, এই অবাঞ্ছিত প্লাবনে তাঁহার এতদিনের সুগঠিত সংসার একেবারে ভাসিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত গৃহকর্ম নষ্ট হইয়া গেল। তিনি ঘর গুরুজন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

আকুল শরীর মো'র বে অ'কুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রন্ধন॥
কে না বাঁশী ব'এ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী ব'এ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈল কোন দোষে॥
অঝর ঝরএ মোর নয়ানের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলো পরাণী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
ব'জাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই লড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়'য়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের ধনী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাষে।
বসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

বৈষ্ণব কাব্যে এই পরকীয়াবাদেরই সমারোহ এবং কান্ত ভাবেরই পূজা। কারণ এই পরকীয়াবাদের ভিত্তিতে সংসারবিরাগী মানবাত্মার প্রেম আপনাকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সুফী ভাব সাধনায় পরকীয়াবাদ বলিয়া কোন কল্পনা স্থান পায় নাই। উভয় চিন্তা পদ্ধতিতেই পরমাত্মাকে লইয়া রস স্বরূপের যে সাধনা তাহা বিরহ-ভিত্তিক; সুফী ও বৈষ্ণব উভয়ের মধ্যেই পরমাত্মার সহিত মিলনাকাঙ্খা প্রবল, তবু চির বিরহেই তাহার পরিণতি। কেননা—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তিথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

বিদ্যাপতি-পদাবলীর রসবিশ্লেষণ

সংসার পথে নায়কনায়িকার যেরূপে প্রেম পরিণয় বিরহ মিলন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী লিখিতে গিয়া তাহারই আশ্রয় লইয়াছেন। উপযুক্ত বয়স না হইলেও স্ত্রীপুরুষ কেহই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেনা। তাই কবিকে সর্বপ্রথম শ্রীমতী রাধার বয়ঃসন্ধি

বর্ণনা করিতে হইয়াছে। শৈশব তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিতেছে দেহের মধ্যে অপরূপ যৌবন।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন লেল॥
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগন বচন কহু নত কয় মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

এমতাবস্থায় দেহের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন দেখিয়া শ্রীমতী নিজেই চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে সর্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সাথীকে সেই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আর শিক্ষা করিতেছেন অতঃপর কি করিতে হইবে।

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥...
মুকুর লই অব করত সিঙ্গার।
সখী পুছই কৈসে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥

সুন্দরী তেমন নবোদ্ভিন্নযৌবনা। তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে এখন তিনি সচকিত, সজ্ঞান। তাই তিনি তাঁহার রূপের ছটা বিস্তার করিয়া দিয়া কৌতুকানন্দ উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীমতী তাই সচকিত হইয়া—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

শ্রীমতী কৌতুকপরবশ হইয়া সজ্ঞানভাবে যে রূপজাল বিস্তার করিতেছিলেন শ্রীমান সেই জালে পা বাড়াইয়া দেখিলেন অপরূপ রূপ, মদনও সেখানে পরাভব মানে—

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ীমালা॥

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেমন যেন উতলা হইয়া রহিলেন। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। এই আনমনা ভাবে তাঁহাকে একটু অনন্যসাধারণ দেখাইল। শ্রীমতী কৌতুকছলে নিজের রূপের সজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন সেই ফাঁদেই তিনি মরিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া গেল। তাই সখীর কাছে তিনি বলিতে গিয়া ধরা পড়িলেন—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥

শুধু কি তাই? লোকটির রূপ অপরূপ; তাহাতে কন্যা 'বরয়তে রূপং মাতা বিত্তম্, পিতাশ্রুতং', হয়ত এ সবই মিলিতে পারে; তখন সখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, প্রিয় সখী—

কি পেখল এক অপরূপ।
শুনইতে মানবী সপন সরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদক মাল॥
তাপর উ পজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥

কিছুদিন এমনি কাটিল। ইত্যবসরে মদনও দুষ্টামি করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহার চিত্ত যখন অস্থির তখন মদন সম্মোহন বাণ ছাড়িয়া তাঁহাকে একেবারে

কৃষ্ণমুখী করিয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীকে দেখিবার জন্য নানা ছল খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেন না। 'কদাচ কখনও দেখা হয় যমুনার জলে, স্নানের ঘাটে, স্নান করিয়া ফিরিবার পথে। এই আধো আধো দেখার মধ্যে মন আরও অধীর হইয়া উঠে।' তখন তাঁহার পূর্বরাগের পূর্ণ অবস্থা। কিন্তু নারীশ্রেষ্ঠ এমনি যে তাঁহার কলায় মদনকে হার মানাইতে তিনি ব্যগ্র; তাই গ্রীবা বাঁকাইয়া, ফিরিয়া চাহিয়া, তীব্র কটাক্ষ হানিয়া একটুখানি দুষ্টু হাসি হাসিয়া যান —

গেলি কামিনী গজহু গামিনী।
বিহসি পলটি নেহারী॥
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক।
কুহকি ভেলি বরনারী॥

এহেন অবস্থায় 'হৃদয়কে শান্ত সংযত করিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না' কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেখিবার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এত করিয়া যতটুকু দেখা গেল, তা শুধু "আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ।" কিন্তু হায়! দুঃখ রহিয়া গেল, "সজনি, ভাল কএ পেখন ন ভেল। মেঘমালা সঞে তড়িত লতাজন হৃদয়ে শেল দই গেল।"

এযাবৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যই প্রকাশিত হইল, আন্তর সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ কেহই লাভ করিতে পারিলেন না। তাহা হইলে কি হয়! শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফেলিয়াছেন। সেই কণ্ঠস্বরের কি মাধুর্য! অনবরতঃ শ্রবণেও তৃপ্তি হয় না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মন সেখান হইতে চলিতে গেলেও পদদ্বয় কিছুতেই নড়িতে চায় না। কারণ সেই স্বর যেন বৈষ্ণব কাব্যের মনোহারিণী সঙ্গীতেরই প্রতীক। তাই—

শ্রবণ রহল ঐছে শুনইত রাব।
চলইতে চাহি চরণ ন যাব॥

আধ্যাত্মিকতার কথা আমরা এখন আর কিছুই বলিব না। কিন্তু ইহা সত্য, যে নায়ক নায়িকার দ্বারা মিলন ও বিরহের পটভূমিকায় এতবড় কাব্যলোক সৃজন করিতে হইবে, তাহাদের উভয়কে পরস্পরের কাছে কবি অনুপমরূপ লাবণ্য মণ্ডিত করিয়াছেন। ভাষাসমুদ্র মন্থন করিয়া যেখানে যে বাক্যটীর

প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিতেছেন। আর বলিতেছেন, অনুরাগের সলিল তীর্থে যে ব্যক্তি শত যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়াও এমন রমণীরত্ন লাভ করিতে সক্ষম হন সত্যই তিনি বড় ভাগ্যবান!

পূর্বরাগ পরিচ্ছেদে উভয়ে উভয়ের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার জন্য সখীর ও দূতীর নিকট এখন কত কথা; কত ছলে কত কৌশলে, কত গালগল্পে তাঁহাদের মন ভুলাইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা! সখী ও দূতী একটু আনমনা হইলে, কি তাহাদের কথা শুনিতে না চাহিলে কত অনুনয় বিনয়, কত সাধ্য সাধন। এত করিয়াও যখন দর্শন পাওয়া যাইতেছে না তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটু অভিমান এবং সেই অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য দূতীর কত অনুরোধ। শ্রীমতী কপট অভিমানের ভান করিয়াছেন,—ইচ্ছা হরি সন্দর্শন। ওধারে হরির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাই দূতী বলিতেছেন—

লাখে তরুবর কোটিহি লতা।
যুবতী কত ন লেখ।
সব ফুল মধু মধুর নহি।
ফুলহু ফুলবিশেখ॥

যে ফুল ভমর নিন্দহু সুমর
বাসি বিসরয় ন পার।
যাহি মধুকর উড়ি উড়ি পর
সেহে সংসারক সার।
সুন্দরি অবহু বচন শুন।
সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি
আপু সরাহরি পুন॥
তোরিএ চিন্তা তোরিএ কথা
শেজহু তোরিএ চাঞো।
স্বপনহু হরি পুনু পুনু করি
নয় উঠ তোরিএ নাঞো।
আলিঙ্গন দয় পাছু নিহারয়
তোহি বিনু শূন কোর।
অকথ কথা আপু অবথা
নয়নে তেজয়ে নোর।

এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের অকালপক্কতার দরুণ গভীর বিরহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; আর মনে পড়ে মেঘদূতের সেই পংক্তিগুলি, যেখানে বিরহী যক্ষ প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই তাঁর প্রিয়ার রূপ দেখিতেছেন আর প্রিয়াভ্রমে আলিঙ্গন দিতেছেন।

তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ গাঢ় ও গভীর দূতীর নিকট হইতে একথা জানিতে পারিয়া রাধিকা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং নিঃসংশয় হইয়া সখীর নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়। দূতীর কথায় ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া দেখিলেন সম্মুখে দুস্তর যমুনা। কৃষ্ণ সেই যমুনায় ভেলা ভাসাইয়া কাণ্ডারী হইয়া বসিয়াছেন। পার তো হইতে হইবে। হরি নিশ্চয় সৎ লোক হইবেন। এই ভরসায় তিনি তাঁহার নৌকায় উঠিলেন। দুষ্টবুদ্ধি হরি ওধারে রাধাকে হাতে পাইয়া দুষ্টামি করিতে ছাড়িলেন না। রাধিকা পড়িলেন ফাঁপরে। তাই তখন মুখরা হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

তুয় গুণ গৌরব শীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরি নাব॥
হঠ ন করিয় কাহু কর মোহি পার।
সবতহ বড় থিক পর উপকার॥
আইলি সখী সবে সাথে হামার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিয় বিবেক॥
তোহেঁ পরনাগর হাম পরনারী।
কাঁপে হৃদয় তুয় প্রকৃতি বিচারী॥

রাধিকার কাতরোক্তিতে সেবারের মত কৃষ্ণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ফলে রাধিকার আশা পূর্ণ হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। যে ভাব এতদিন গুপ্ত ছিল, তাহা যে এখন তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে যাইতে চায়। সংসারে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিতে থাকে। তখন দূতী দেখিল বিপদ তো তাহারই। কেননা জোরপূর্বক সেই তো তাঁহাকে সংসার মরুপথে বাহির করিয়া আনিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধরা পড়িয়া গেলে লাঞ্ছনার ভাগ তাহারও তো কম হইবে না। তখন সে বলিতে থাকে

'কানুর জন্য তোমার মনের আর্তিকে একটু ঢাকিয়া চাপিয়া রাখ— গুরুজনকে একটু লজ্জা সরম করিয়া চল—

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোহে পুনু কহওঁ বুঝাই।।
কানুক ভাব যো হোই।
হিয় মাহ রাখব গোই।।
কেহ জনু লখইতে পার।
বেকত করবি কুলাচার।।
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিসরবি তাহ।।

মুর্শিদরূপী দূতীর হাতে যে পড়ে তাহার কি আর রক্ষা আছে! তাই দেখি অঘটনঘটনপটিয়সী এই দূতী গুরুজনের চক্ষু এড়াইয়া দিবাভাগে কানুর পীরিতি গুপ্ত করিয়া রাখিতে বলিতেছে। রাত্রির আবির্ভাবে তাঁহাকে ভুলাইয়া বাড়ীর বাহির করিতেছে, কুলবালা রাধিকা, কুলে কলঙ্ক পড়িবে সে ভয় তাঁহার আছে। তাই তিনি বলিতেছেন, 'অমন কাজ আমার দ্বারা হইবে না; আমি আর কিছুতেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইব না।' মুর্শিদ বলিল 'ভয় কি, সঙ্গে তো আমি আছিই। তুমি আমাকে তো বিশ্বাস কর!'—

কাহে ডরসি সখি চলু হম সঙ্গ।
মাধব নহি পরশব তুয় অঙ্গ।।
হই রজনী ফুল কানন মাঝ।
কে এক কিরত সাজি বহু সাজ।।
কুসুমক ঘোর ধনুক ধরি পানি।
মারত শর বালাজন জানি।।
অতএ চলসহ সখি ভিতর কুঞ্জ।
যাঁহা রহ হরি মহাবল পুঞ্জ।।

দূতীগুরুর শিক্ষায় দিনে দিনে ভয় ভাঙ্গিল। তাই গুরু 'এত কহি অনল ধনী হরিপাশ, পূরল বল্লভ সুখ অভিলাস।' লজ্জা সংকোচ, ভয় তরাসের বাঁধ আজ টুটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একি হইল? এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া মুখ ভার করিয়া রাধিকা গৃহে ফিরিলেন। দূতী এই মিলন ঘটাইয়া দিয়া প্রত্যক্ষভাবে আজ হইতে বিদায় হইল। কারণ সে বুঝিয়াছে যিনি মিলনের

আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি আপনার পথ এখন হইতে আপনি চিনিয়া লইতে পারিবেন।

ইহার পর কিছুদিন গেল। রাধিকার গৃহবাস এখন কঠোর হইয়া উঠিল। নূতন অনুরাগে নূতন প্রেমে দীক্ষিতা নারী সংসারের কাজ সারিয়া চুপেচুপে প্রিয়মিলনে বাহির হইলেন—

নব অনুরাগিনী রাধা।
কিছু নহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচকুচ মানয় ভার॥
কর সঞে কঙ্কন *মুদরি (*অঙ্গুরী)
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥

সেখানে গিয়া দেখিলেন মাধব পূর্বনির্দেশমতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার নিকটেই আসিলেন। তখন—

কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥

অতঃপর মিলন। কবি নিঃসঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

সখী পরবোধি শয়নতলে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পাণি॥
ছুঁইতে বালি মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥

নহি নহি কহ নয়ন ঝর লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥...
আঁচল লই বদন পর ঝাঁপে।
থির নহি হোয়ত থর থর কাঁপে ॥

এ মিলনে মাধবের তৃপ্তি হইল না। তিনি অভিযোগ করিতে লাগিলেন—

...সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
কয়ইতে কোরে মড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র ন শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥...
ভণই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগুধিনী নারী ॥

এই নির্দয় মাধবের হাত হইতে রাধা কোনপ্রকারে বাঁচিয়া গেলেন। পীড়িতা হইয়াছেন তিনি সত্য, কষ্টও পাইয়াছেন কম নয়; কিন্তু মনের ভিতরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। তাই সখীরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যেহো করল সোই নাগর রাজ ॥
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দুতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরথর কাঁপ।
সোই লুবুধমতি তাহে করু ঝাঁপ ॥
চেতনা হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি ॥
হঠকরি নাহ কয়ল যত কাজ।
সে কি কহব ইহ সখিনী সমাজ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সে ধনি যে থির তাহে নেহারি ॥

আর একদিনের কথা। সখীরা জিজ্ঞাসা করিলে রাধা অকপটে বলিয়া গেলেন। এবার তাহা স্বীকার করিতেই তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি বলিতেছেন আর মিটি মিটি হাসিতেছেন।

কি কহব হে সখী আজুক বিচার।
সে সুপুরুখ মোহে কয়ল শিঙ্গার ॥
হসি হসি পহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥
যব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর শপথ হাম কিছু যদি জান ॥

এই শেষের কথাটিতে দেখিতেছি শুধু রাধিকা নন, রসিক কবিও একটু খানি মুচকি হাসি হাসিয়া লইলেন। আর সখীরা তাঁহার আনন্দে কেহ বা আনন্দিত হইলেন, কেহ বা দুঃখে ক্ষোভে ঈর্ষান্বিতা হইলেন।

তখন হইতে আর কোন পক্ষের কোন সঙ্কোচ নাই। সব কিছু গতানুগতিক ও নিয়মিত হইয়া গিয়াছে। নিত্যই এমনি হয়। এমন সময় 'আওল ঋতুপতি রাজবসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ।' সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি নূতন রূপ ধারণ করিলেন। তরুশাখায় নূতন পাতা গজাইয়া উঠিল, ফুলে ফলে পত্রে পুষ্পে চারিদিক শ্যামল হইয়া উঠিল। মানুষের মনেও নব বসন্তের জোয়ার জাগিল। চারিদিকে আনন্দের সমারোহ। রাধা মাধব সেই বসন্ত হিল্লোলে নূতন করিয়া তাঁহাদের পুরাতন বীণায় সুর সংযোজন করিলেন। এবারের সুরও হইল বড় মধুময়। আর সেই সুরে তাঁহাদের শত বান্ধবী তান ধরিলেন। শত কিন্নরীকণ্ঠে সারা বৃন্দাবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাই —

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ।
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল।
মাতল নব অলিকুল।
বিহরই নবল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জবন শোভন।
নব নব প্রেম বিভোর ॥
নবল রসাল মুকুল মধুমাতি।
নব কোকিল কুল গায়।।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই।
নব রসে কাননে ধায়।।

নব যুবরাজ নবল নব নাগরী।
মিলয়ে নব নব ভাঁতি॥
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন।
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

এই আনন্দবন্যার সঙ্গে বসন্ত বিহারের আর একটি গীত জুড়িয়া না দিলে ইহার পূর্ণতা উপলব্ধি করা যাইবে না।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটনী নটরঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

বসন্তের এত অবিমিশ্র আনন্দের পর সখীরা তাঁহাদের দুইজনকে রাখিয়া ধীরে ধীরে বিদায় লইলেন। আনন্দের আবেগ এখন কমিয়া গিয়াছে। দুইজনে নিরালা বসিয়া মাঝে মধ্যে কখনও একটু রসালাপ, কখনও একটু হাসি, আর কখনও একটু কৌতুক—এক্ষণে তাহাই চলিতেছে।

যে নায়ক নায়িকাকে লইয়া বিরাট আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিবেন, কবি তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের চিত্র আঁকিয়া একেবারে সর্বকালীন সর্বমানবের পরিচিত রীতিতে তাঁহাদের মিলন কাহিনীর বর্ণনা দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পাঠককে ও রাধা-মাধবের সখী-বৃন্দকে অসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সেখান হইতে রাধামাধবকে লইয়া নিভৃতে সরিয়া পড়িলেন। অতি কৌশলে সকলকে দূরে সরাইবার পর রাধিকাকেও তাঁহার বল্লভ হইতে দূরে লইয়া গেলেন।

ইহার পর মাধবের সঙ্গে তাঁহার আর তেমন দেখা হয় না। মাধব ক্বচিৎ এখানে অভিসারের নির্দেশ দেন, রাধিকাও প্রিয়মিলনের আশায় অপরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া হৃদয়াবেগে পথবিপথ না মানিয়া সেখানেই অভিসার করেন। গুরুজনের বাধাকে তিনি আজ জয় করিতে পারিয়াছেন। তাহাদের চোখে ধূলি দিয়া সন্তর্পণে চলিতেছেন—

গুরুজন নয়ন পসার পবন জঞো।
সুন্দরী সতয়ি চললি।...
কি আরে নবি অভিসারক রীতি।
কে জাবে কওন বিধি কামে পঢ়াউলি॥
কামিনী ত্রিভুয়ন জিতি॥
অম্বর সকল বিভূষণ সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী॥
কেহু কতহু পথ লখহি ন পারলি
জনি মসি ডুবলি ভমরী॥

গভীর রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। চিন্তা করিবার অবসর নাই। মাধবের নির্দেশ—তাঁহাকে যাইতেই হইবে। পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিলেন।

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পড়য় দুরবার॥
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন
সংশয় পড় অভিসার॥
সজনি বচন ছুড়ইতে মোহি লাজ॥
যে হোয়ত সে বরু হোয়ও সবে হমে অঙ্গিকরু
সাহসে মন দেল আজ॥...
চরণ বেধিল ফণী হিত-কয় মানল ধনী
নেপুর না করএ রোল॥

সুমুখি পুছঞো তোহি স্বরূপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওল ।।

অন্ধকার রাত্রি। ঘনঘন জলধারায় সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। অবিরত জলধারায় হৃদয়ের আকর্ষণ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। মাধবকে না দেখিলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত না হইলে তাঁহার চলিবে না। যেমন করিয়াই হউক, তাঁহাকে যাইতে হইবে।

ঝর ঝর বরিষ সঘন জলধার।
দশ দিশ সবহু ভেল আঁধিয়ার ।।
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার ॥
কৈসনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সুমরই জর জর অথির পরাণ ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান ।।
ঘর মাহ রহত রহই না পার।
কি করব ই সব বিধিন বিথার ।।
চঢ়ব মনরথ সারথি কাম।
তোরিত মিলায়ব নাগর ধাম।।

ক্রমেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা গভীর হইতেছে। সে ব্যাকুলতা বাড়াইয়া তুলিতেছে নিদারুণ প্রকৃতি। এই পদটিতে অপরূপ ধ্বনিব্যঞ্জনাময় শব্দ প্রয়োগ করিয়া কবি প্রকৃতির দারুণ দুর্যোগময় রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আকাশ ঘন মেঘে আবৃত। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ঘন ঘন অশনিপাত হইতেছে। সমগ্র ভূখণ্ড আলোড়িত করিয়া বাতাস উঠিয়াছে। ওধারে বিদ্যুৎ এধারে ঝড়। দুইয়ে মিলিয়া যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়াছে। এমন দিনে রাধিকার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। তাহার পক্ষে বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়াছে—কারণ কানু নির্দেশ দিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে চলিয়া গিয়াছেন। এই বৃষ্টি বাদলের দিনে তাঁহার কি উপায় হইবে? ঘন দুর্যোগে কোথায় কোন দূর বনে দাঁড়াইয়া তিনি একা একা রাধিকার পথ চাহিয়া রহিবেন। একথা স্মরণ করিতে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ।।
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘনঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি
অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ।।
তোরিতে চলঅব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার ।
কবি শেখর বচনে অভিসার
কিয়ে সে বিঘিন বিথার ।।

কানুর জন্য বর্ষাগভীর রাত্রে শ্রীরাধা-হৃদয়ের যে আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে বিদ্যাপতির লেখনীতে তাহাই অনবদ্য ধ্বনি সংক্রমকে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রেমগর্বে গরবিনী আত্মহারা পাগলিনী রাধিকার অভিসার বর্ণনায় কবি যেমন একদিকে আত্মবিহ্বল অন্যদিকে তেমনি সুচিন্তিত এবং সযত্ন-সন্নিবিষ্ট শব্দ প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ। ইহাকেই বলা যায়—"The gorgeous imagery of Vidyapati and the majestic faces of his musie might, o n occasions, tends to sweep you off your feet, but the poet would never lose his. It is not of many that this could very well be said." ইহা যে কতখানি সত্য, তাহা ছন্দোস্রোত বজায় রাখিয়া যথার্থ আবৃত্তি বা পাঠের দ্বারা ধরিতে না পারিলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতি কাব্যের যথাযথ আবৃত্তিই উক্ত কাব্যের সঙ্গীতপ্রাণ ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকে।

যাহা হউক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া নদীনালা পার হইয়া আসিয়া যমুনার অপর পারে যখন রাধিকা মাধবের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য মিলিত হইলেন তখন তাঁহার মনে অনেক কথা, বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না : শুধু জানাইলেন, 'হে মাধব তোমার সঙ্গে সব সময়েই মিলিত হইবার ইচ্ছা, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, কেননা—

পূরল পুর পুরজন পিসুনে
যামিনী আধ আঁধার।
বাহুতরি, হরি! পলটি যাএব
পুনু যমুনা পার॥

আর বলিতে পারিলেন না। যে রুদ্ধ আবেগ মাধবকে সাক্ষাতে পাইয়া উথলাইয়া উঠিতে চাহে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিলেন না, কিন্তু শঙ্কিত হৃদয়ের ভাষা একটি কথাতেই গুমরিয়া উঠিয়া তাঁহার মর্মন্তুদ অসহায় অবস্থা জানাইয়া গেল—

একূলে কূলকলঙ্ক ডরাইঅ
ওকূলে আরতি ডোরি।

ইহা যেন 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যা বেলায় কে ডেকে নেয় তারে?' এহেন অবস্থায় 'আমি যে আজ সঙ্কটাপন্ন আমার আশ্রয় কোথায়?' চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সেই অশ্রুজলই নির্বাক ধৈর্যে বলিয়া গেল—

জগতে কত না যুব যুবতী কত না লাবএ প্রেম

তবে আমার বেলায় কেন এ অপবাদ? তাই যাইবার কালে রাধা মাধবের কাছে শুধু একটি প্রার্থনাই করিয়া গেলেন। বহুদিন পরে যদি আবার দেখা হয় তবে

গোচর এক মোর পএ রাখবি, রাখবি দুঅও লাজ।
কবহু মুখ মলান না করবি হোয়ত পুনু সমাজ।

কারণ আমার মন যাহাই বলুক না কেন, তোমার মুখে বিষাদের ছায়া আমি দেখিতে পারিব না, তাহা হইলে দুঃখভারগ্রস্ত আমার এ হৃদয় আরও ব্যথিত হইবে।

এখন হইতে দেখি মাধব কেন যেন অহেতুক শক্ত হইয়া উঠিতেছেন। শুধু শক্ত নন, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই রাধিকাকে ভুলিতে বসিয়াছেন।

হৃদয় হরণ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন। আর আমাদের মনে পড়িতেছে 'men love for a while, but women love longest.' এখন তিনি তাঁহার সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন না। বহু অনুসন্ধানের পর একদিন রাধিকা তাঁহাকে ধরিলেন, কিন্তু মাধব কিছুতেই তাহার কথা শুনিবেন না; না শোনার কারণস্বরূপ একটা দোষও তাঁহার চরিত্রে আরোপ করিলেন। রাধিকা বিমূঢ় হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

এতদিন ছল পিয়া তোহ হামে যেহে হিয়া
শীতল শীল কলাপে।
তোহে ন কানধরু, বিনতি দূর করু
দুরজন দুরিত অলাপে॥

মাধব মুখ ফিরাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। তখন বাধ্য হইয়া অসহায়া রাধিকা রমণীসুলভ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না।

তোহ-হাম পেম যত দুরে উপজল, সুমরবি সে পরিপাটী।
আগে পর-রমণী রঙ্গরস ভুললাহে কওনে কলা হম ঘাটী?

কিছুতেই যখন কিছু হইল না তখন ক্রোধ-কম্পিতা স্বরে বলিলেন—

পুরুষ-হৃদয় জল দুঅও সহজে চল,
অনুবন্ধে বাঁধ থিরাই।
সে যদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ।
উঁচেও নীচ পথে ধাই॥

ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ও গ্লানিতে পড়িয়া রাধিকা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শয্যা লইলেন—আর উঠিলেন না। মনে করিলেন 'সংসারকেই ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিব।' কিন্তু তাহা হইল কোথায়? তাই বিরহের সূচনা হইল।

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতয় সভরণ কুন্তল চীর॥
তুয় পথ হেরি হেরি চিত নহি থির।
সুমরে পুরুব নেহা দগধ শরীর॥

তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া আমাদের বহুদিনবিস্মৃত সেই দূতীগুরু আবার

ফিরিয়া আসিয়া মিলনের ভার লইয়া মাধবকে গিয়া বলিল—

কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহী যুবতী মাগ দরশন দান॥

দূতীর বাক্যে মাধব চুপ করিয়া রহিলেন। রাগ করিয়া তাই দূতী বলিল,—

'রসিকক সরবস নাগরী বাণী।
ভল পরিহর ন আদরি আনি॥

আরও বলিলেন,—

মাধব করিয় সুমুখি সমধানে।
তুয় অভিসার কয়ল যত সুন্দরী
কামিনী করয়ে কে আনে॥
বরিষ পয়োধর ধরণী বারিভর
রয়নী মহাভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনী তুয় গুণ মনে গুণি
তসু সাহস নহি সীমা॥...
নিজ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারি।
তুয় অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুণল বরনারী॥

'যে তোমার জন্য এত করিল তাহার প্রতিদান কি তুমি দিবে না?' দূতীর কথায় চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া মাধব মন ফিরাইলেন। 'গিরিসম গরুয়' মান পরিত্যাগ করিয়া রাধার সঙ্গে মিলিলেন। কিন্তু তাহা অত্যল্পকালের জন্য। যেই দূতী চলিয়া গেল অমনি মাধব শ্রীমতীকে 'পড়া পুথি সম' ফেলিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। রাধা হৃদয়ের দুঃখ বাড়িয়া চলিল। সুফী কাব্যে যেমন বৈষ্ণব কাব্যেও তেমনি দুঃখের সাধনাই বড় সাধনা। দুঃখই মানুষের সত্যকারের স্বরূপ পরিস্ফুট করে। অন্তরের খাঁটি জিনিস দুঃখের হাপরে গলিয়া নিকষিত হেমরূপে বাহির হইয়া আসে। মানুষ সংসারের মধ্যে থাকিয়া স্রষ্টার ডাকে সাড়া দেয়, তাঁহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়; তখন সংসার তাহার কাছে অরণ্য বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় সব মিথ্যা, সব মায়া; আর প্রাণ তখন বলিতে থাকে—

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাঁকার।
কতদিনে ঘুচব গরুয় দুখভার ॥
কতদিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতদিনে ভ্রমরা কমলে করুকেলি ॥
কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহু পয়োধরে দেয়ব হাত ॥
কতদিনে করে ধরি বইসাওব কোর।
কতদিনে মনোরথ পূরব মোর ॥

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে বিরহের গূঢ় অর্থ ইহাই। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যখন সব কিছু কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যখন ভরা ভাদরে কানায় কানায় ভরা নদী কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যায়, মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া আকাশে মেঘ তাহার পক্ষচ্ছায়া বিস্তৃত করিয়া দেয়, ঝড়ঝঞ্ঝা যখন ধূলিবালি উড়াইয়া পথিককে বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি' যখন গর্জন করিতে থাকে, যখন একটা স্নিগ্ধ সজল আবহাওয়া চারিদিকে তাহার শীতলতা ছড়াইতে থাকে, আর মেঘমেদুর বর্ষাকাল উপর হইতে অবিরল ধারায় বর্ষণমুখর হইয়া উঠে, তখন প্রোষিতভর্তৃকা রাধিকা-হৃদয়ও তাঁহার কোন সুদূরের প্রিয়ের আশায় উতরোল হইয়া উঠে। এমন দিনে মন মন্দির শূন্য না হইয়া ত পারে না। চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহু পূর্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
——কিংপুনর্দূর সংস্থে।

কালিদাস যে কথাটি শুধু একটা দীর্ঘ তপ্তশ্বাসের সাহায্যে সারিয়া দিয়াছেন, বিদ্যাপতির বহু বিশ্রুত পদে সেই চিরকালের কথাটি রাধিকা হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া একেবারে বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—

সখি হে হমর দুখক নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া ॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ॥

রাধিকার সেই অকৃত্রিম মর্মন্তুদ দুঃখজ্বালায় সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কবি অমনি বলিয়া উঠিলেন,— তোমার যখন এই অবস্থা তখন—

কৈসে গমাওবি
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

ইহার পর রাধিকা আর আত্মস্থ হন নাই। বিরহের দশম দশার নিকটবর্তী হইয়া অজ্ঞানে শুধু হরি হরি স্মরণ করিয়াছেন—

অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধা আধা বাণী ॥
রাধা সঞো যব পুনতহি মাধব
মাধব সঞো যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশ দারু দহনে যৈসে দগধই
অকুল কীট পরাণ।

ঐসন বল্লভ হেরি সুধা মুখি
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

এই দুর্লভ বল্লভ-বিরহই রাধিকার আধ্যাত্মিকতার পথকে উন্মেষিত করিয়া দিল। ইহা একেবারে সমাধির অবস্থা, দ্বৈতভাবের পরিবর্তে অদ্বৈতভাব। বৈদান্তিক দর্শনের সত্য বৈষ্ণব অনুভূতিতে এমনিভাবে ধরা দিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সুফী কবির চিরবাঞ্ছিতের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলনের একাত্মতা জনিত মধুময় অনুভূতির তুলনা করা যাইতে পারে। আমীর খসরুর কথায় তাহা ঃ—

"মন্ তু শোদম্ তু জান শুদী
তা কস্ না গোয়েদ বা'দ আযী
মন্ দি গরম্ তু দিগরী।
আমি তুমি হলেম, তুমি আমি হ'লে
আমি হলেম দেহ, তুমি হ'লে আত্মা ;
এর পর আর কেউ বলতে পারবে না
আমি একজন আর তুমি একজন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানব মানবীর অবস্থা বর্ণনের ভিতর দিয়া বিদ্যাপতির কাব্য পথ বাহিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু এইখানে আসিয়া মানবিকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র কাব্য অংশ হইতে ইহার পরের 'ভাব সম্মিলন' সর্গের দুই একটি পদ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পড়িলে সেখানে হয়ত অশ্লীলতার কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটির পর একটি স্তর ডিঙ্গাইয়া 'ভাব সম্মিলনে' পৌঁছিলে অশ্লীলতার ও নীতির প্রশ্ন মনেই ওঠে না। রাধিকার দেহদানের নিঃসঙ্কোচ আত্মোক্তি ও সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে কোথাও যেন উন্মাদনা বা কামবহ্নির জ্বালা আর দেখা যায় না। সবই যেন প্রশান্ত, একটা সুন্দর অমলিন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, অভিসার ও মিলনের মধ্যে পার্থিব নায়ক নায়িকার দাম্পত্য বা অনুরূপ জীবনের যে প্রকাশ্য জীবন্ত ছবি দেখিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে সুস্থ মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক ক্রমই লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্যদেহ বিগলিত 'বেদ্যান্তর-স্পর্শ' যে রস, কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া সম্ভোগের মধ্যেই তাহাকে ধরিতে চাহিয়াছেন। এযাবৎ

যৌবন লীলার যে চাপল্য, যে প্রাণোন্মাদকর আত্মরতির প্রাধান্য, যে তুমুল ঝড়ঝঞ্ঝার ঘনঘটা, যৌবন বেদনারসের উচ্ছলতার যে লীলায়িত বর্ণনা আমরা পাইয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে যে কম্পন ও আনন্দ-আবেশ ইত্যাদির কথা আছে তাহাও বিদ্যাপতির হাতে পড়িয়া আধ্যাত্মিকতার পূর্বতটে নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির এই গানগুলিতে ভাষা, ছন্দ, শ্লেষ, অলঙ্কার ও অনুপ্রাসের জাঁকজমকে রাধামাধবের কেলি-কোলাহলের যে রূপ আমরা পাই তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব একটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ "বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটা সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, কেশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফূরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি ; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কতছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তরদেশে যে গভীরতা, যে নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।" রবীন্দ্রনাথের এই মনোমুগ্ধকর রসালোচনা বিদ্যাপতির গানগুলির সম্বন্ধে এই স্তর পর্যন্ত অপরূপভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ইহার পর ভাব সম্মিলনে ও প্রার্থনায় ইহা আর খাটে না।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া ব্রজধামে আর ফিরিয়া আসেন নাই। এখানেই তাঁহার বৃন্দাবনলীলার চিরসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বিরহের পর মিলন-বর্ণনামূলক যে সকল পদ বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা প্রকৃত দৈহিক মিলনের নহে। বিরহের পূর্বে সেই যে মাধব রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তখন হইতে রাধা-মাধবে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। রাধা তাই বিরহের অবস্থায় কল্পনার আতিশয্যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন— মাধব আবার ফিরিয়াছেন, আবার তাঁহাদের মিলন ঘটিয়াছে। সেই মিলনে কত আনন্দ! ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভাবসম্মিলন বা বিরহের অবস্থায় ভাবনার ভিতর দিয়া প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এ মিলন তাই উত্তাপহীন ; একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত আবহাওয়াই আমরা এ মিলনে অনুভব করি। তাই এ মিলন এত মধুর, এত সুন্দর। তাই যখন সখীকে রাধার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিতে শুনি তখন বুঝিতে

পারি এ মিলন কোন্ ছন্দে গাঁথা ঃ—

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে ।।
ন দেখিয় ধনুগুণ ন দেখিয় সন্ধানে।
চৌদিশ পরএ কুসুম শর বাণে ।।

এতদিন পরে রাধার সঙ্গে চক্ষু মিলাইয়া আমরাও মদনের ধনুক, গুণ অথবা সন্ধান কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। মদন এখন হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বঙ্ক বিলোকন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগোল জনি সমুদ্র হিলোরা ।।
উঠলি চেহাই আলিঙ্গন বেরি।
রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরি ।।

বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত করিয়া স্বপ্নলব্ধ মাধবকে যেই আলিঙ্গন করিতে গেলেন অমনি শূন্যশয্যা দেখিয়া রাধা আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন।

রাধা স্বপ্নাবস্থায় ভাবনা করিতেছেন তাঁহার প্রিয় যখন তাঁহার গৃহে আসিবেন তখন তাঁহাকে বরণ করিতে গিয়া যত কিছু মঙ্গলাচার তাঁহার দেহের উপরেই সম্পন্ন করিবেন। আপন আত্মার পর আপন দেহ ছাড়া তো মানুষের আপনার আর কিছু হইতে পারে না। তাই যখন পূর্বাহ্নেই তিনি আত্মদান করিয়া বসিয়া আছেন তখন তাঁহার দেহও বিদেহ হইয়া গিয়াছে। ইহারই পূর্বে আমরা দেখিয়াছি মদন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধার এই যে দেহসজ্জা ইহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যে কাম তাহা হইতে উপজিত হয় নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে বিহ্বল হইয়া অবশ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে আনন্দ আছে ইহা তাহাই। আপন বলিতে তাঁহার আর কিছুই নাই—কৃষ্ণের সুখই তাঁহার সুখ। সুতরাং কৃষ্ণ যদি সুখী হন তবে তাঁহাকে সুখী দেখিয়াও তিনি মরিতে পারিবেন। কারণ এই দেহদান ও তদহেতু দেহের উপরেই বাসরশয্যা নির্মাণ ইহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি হইতে জাত। তাই যখন রাধিকাকে বলিতে শুনি —

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যত হুঁ করব নিজ দেহে ।।

কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব।
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিকে পশারব চাঁদক হাট॥

দেহের উপর বাসরশয্যা নির্মিত যখন হইল তখন মধুলোভী ভ্রমর মাধব নিশ্চয় তাঁহার অঙ্গনে আসিবেন। তিনি আসিলে রাধা কি করিবেন? না—

পলটী চলব হম ঈষত হসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করবে॥...
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহুসি বোলব নহি নহি॥
সহজহি সুপুরুখ ভোমরা।
মুখ কমল মধু পিয়ব হমরা॥
তৈখন হরব মোর গেয়ানে।

এর উত্তরে

বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে।

এবারের স্বপ্নে কল্পনা নয়, রাধা একেবারে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—মাধব আসিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে মিলন হইয়াছে। তাই নিজের সৌভাগ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা বাষ্পাকুল।—

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিক ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোএ অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।।

বহু বিনিদ্র রজনী অপেক্ষা করার পর আজ তিনি প্রিয়মুখ দর্শন করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত চাতকের বারিবিন্দু-পানের মত প্রিয়দর্শনে আনন্দবারি পান করিতেছেন। তাঁহার জীবন ও যৌবন আজ তাই ধন্য। এতদিন যে দীর্ঘ প্রত্যাশা বুকে পুষিয়া চারিদিকে অস্থিরচিত্তে চাহিয়া থাকিতেন সেই অস্থিরতা শান্ত হইয়াছে— আর চারিদিকের সন্দেহ দ্বন্দ্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহার বাড়ীঘর, তাঁহার দেহমন তাঁহারই একান্ত আপনার বলিয়া মনে হইতেছে। বিরহের দিনে দুঃখের বর্ষায় দুষ্ট কোকিল এত জায়গা থাকিতে ইচ্ছা করিয়া শুধু তাঁহাকেই জ্বালাইতে আসিত, চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ ছড়াইয়া তাঁহারই জ্যোৎস্নাস্নাত আঙ্গিনা দিয়া নিত্য অভিসারে বাহির হইত, সঙ্গে বহিত মলয় পবন। রাধিকার মিলনের এই পূর্ণানন্দের দিনে তাহারা সব গেল কোথায়? সমস্ত জগৎ আসিয়া তাঁহার মিলনানন্দ দেখিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াক, মদন যত পারে বাণ নিক্ষেপ করুক, আর সেই দুষ্ট কোকিলটা তাহার শত সহস্র সঙ্গী লইয়া অনবরতঃ পিকরব করিতে থাকুক, পবনদেব তাঁহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া মন্দ মলয়ানিল বহাইতে থাকুন, আর সেই মৃদু পবনহিল্লোলে তাঁহার অন্তর অহরহঃ দোল দিক। বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের এই কবিতাটিতে প্রকৃতি ও মানবমন ওতোপ্রেতভাবে জড়িত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের সেই দৃশ্যটি,— যেখানে বসন্তসেনা তাঁহার প্রাণবল্লভ চারুদত্তের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, বাহির হইতে তাঁহার মা ও আত্মীয় স্বজনেরা রাজার শ্যালককে বরণ করিবার জন্য তাঁহাকে নানাভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু বসন্তসেনা সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া বিরহের আগুনে দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার চারুদত্ত আসিলেন। তাঁহার আনন্দের আতিশয্য আজ দেখে কে! হৃদয়াবেগের চরম প্রকাশক্ষণে নৃত্যকুশলা বসন্তসেনার

হৃদয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল চটুল নৃত্যের চপলভঙ্গী। আনন্দ প্রকাশ আজ ভাষায় নহে। তাঁহার ভাষা তো নৃত্য! তাঁহার আনন্দ ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহারই বাহু ধরিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতেই নাথের আগমনবার্তা জানাইলেন। হৃদয়াবেগের চরমোৎকর্ষ প্রকাশে আজ মাতা ভগিনী দাসী একাকার হইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্য প্রকৃতি নামিয়া আসিল। পায়রা উড়িল, ঝরণার জলে পরস্পর চঞ্চুসংলগ্ন হংসমিথুন পাখা ঝাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণ শাবকের ছুটাছুটি, পাখীর কূজন, প্রিয়জনের কলহাস। বসন্তসেনার হৃদয় দুয়ার আজ খুলিয়া গিয়াছে। তাই তিনি নৃত্যচঞ্চল। তাঁহার আনন্দে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে প্রকৃতিও বাকমুখর। রাধিকা হৃদয়ের আনন্দোন্মত্ততার সঙ্গে প্রকৃতিও অনুরূপ ঝঙ্কার তুলুক, বিদ্যাপতির এই পদে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

রাধার এত দিনের দুঃখ এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল—

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দুরে গেল॥

আজিকার আনন্দ শুধু অনুভূতিসাপেক্ষ, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভাষা তাই আনন্দের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় রাধিকা মাধবের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া স্মিত হাসিয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥

দেখ মাধব, মানুষ হাতে দর্পণ লইয়া যেমন নিজের মুখ দেখে আমি দর্পণ ভাবিয়া তোমাকে হাতে হাতে রাখি, আর তোমাতেই আমি দেখি আমার মুখ; মেয়েরা সুন্দর একটী ফুল দেখিলে অতি যত্নে যেমন সেটিকে আপন

মাথার খোঁপায় তুলিয়া রাখে, আমিও তেমনি তোমাকে আমার খোঁপার ফুল করিয়া রাখিয়াছি। চোখ না থাকিলে আমাদের চলে না; সেই চোখের একটি অলঙ্কারই আছে, সেটি কাজল। আমার চোখের জ্যোতি উজ্জ্বল করিতে আর চোখের সৌন্দর্য বিধান করিতে তোমাকে আমি কাজল করিয়া রাখি। পান খাইয়া মানুষ মুখ লাল করে, সেই পান মানুষের মুখের সৌন্দর্য বাড়াইয়া তোলে। আমার তো সৌন্দর্য নাই, আমি তোমার রূপেই রূপসী, তাই তোমাকে আমার মুখের পানরূপে দেখি। বুকের উপর মৃগচন্দন লেপিলে তার মনোমুগ্ধকর গন্ধে বুকের শোভা আপনি বাড়িয়া উঠে, তুমি আমার বুকের সেই কস্তুরি। গলায় হার পরিলে তবে তার আলোকে গলা হয় শোভিত, সুতরাং তুমি আমার সেই গলার হার। আর কি বলিব বল? তুমি আমার সর্বস্ব! আমার গৃহের মণিশ্রেষ্ঠ, গৃহকর্তা। আর কি বলিলে তাঁহাকে আপন হইতেও আপন করিয়া বলা যায়, রাধা ভাবিয়া না পাইয়া শেষে বলিলেন— বঁধু, আমি পাখী, আর তুমি সেই পাখীর পাখা। না, আমি মীন (মাছ) আর তুমি আমার জীবনাধার পানি। এবারে বুঝিলে তো? যদি না বুঝিয়া থাক, আচ্ছা শোন তবে,জীবের যেমন জীবন, তুমি আমার সেই জীবন। তুমি কাছে থাকিলে আমি জীবিত, তুমি দূরে গেলেই আমার মৃত্যু। প্রিয় বন্ধু মাধব! তোমাকে আমি এত ভালবাসি, আমার মাথার দিব্যি দিতেছি, তোমাকে বলিতেই হইবে 'তুহু' কৈসে মাধব, কহ তুহু' মোয়'। নির্দয় মাধব আর কি বলিবেন! এযাবৎ একটি কথাও তো বলেন নাই! তাই সহানুভূতিশীল কবি দুঃখের আঁখিজলে লেখনীকে সিক্ত করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠের মত বলিলেন, রাধা! তুমি বুঝিতে পার না, তোমরা উভয়েই উভয়ের নিকটে একইরূপে প্রতীয়মান।

এই পদটির সহিত সাধক কবি আমীর খসরুর নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলনীয়ঃ

আমি যদি হোতাম তুমি, তুমি হ'তে মোর প্রেমিক
আমার খোঁজে দিবস রাতি মরতে ঘুরে দিগ্বিদিক।
তোমায় ভুলে আমি যদি যেতাম ঘৃণা উপেক্ষায়
বলো দেখি সত্যি ক'রে—আমায় কিবা বলতে ঠিক? *

* ফজলুর রহমান কৃত অনুবাদ।

ব্যক্তিগত অনুভূতির, একাত্মতার ও অদ্বৈত ভাবদ্যোতক অনুপম সৃষ্টি এই পদটি। একদিকে আনন্দবন্যা, অন্যদিকে চোখের পানি। এই দুইএর মিলনে ভাষা আর চলিতে পারিল না। তাই মানুষের চরমোপলব্ধির ভাষা সুরহীন হইয়া বিদ্যাপতির লেখনীতে শুধু ছোট ছোট কথায় ধরা দিল। কিন্তু ইহার পর রাধার কোন্ অবস্থা দেখিতেছি? সখী জিজ্ঞাসা করিলেন, এত আনন্দানুভূতি তোমার কোথা হইতে আসিল? রাধা কোন উত্তর দিলেন না। ভাবসম্মিলনে পৌঁছিবার সময়ে মানবিকতার শেষ যে চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল তাহাও এতদূরে আসিতে আসিতে শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই ধরাশায়ী ভূমিলীন দেহ হইতে যে আত্মা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহাই যেন দূর দিগন্ত হইতে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া রাধা নামের কোন মানবীর ভাষায় জগৎ প্লাবিত করিয়া তান ধরিয়াছে,—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল॥
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক॥ *

বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আলোকোদ্ভাসিত মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া যখন আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে তখন সাধারণ মর্ত্যমানুষ চমকিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। 'সেই পরমাত্মার সঙ্গে পার্থিব আত্মার

* পাঠান্তরে কহ কবিবল্লভ।

অনাদি কালের বিরহমিলন এবং ঐ যে প্রেমময় পরমাত্মা (কৃষ্ণ)-ময় জগৎ যাহার প্রাণোন্মাদকর আকর্ষণে অবশ আত্মবিস্মরণ এবং তাহার পরেও অতৃপ্তি ভরা দীর্ঘশ্বাস ও গভীর হাহাকার, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার (romanticism) লক্ষণাক্রান্ত।' 'যে দুর্জ্ঞেয় উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়রস জগৎকে ও জীবনকে মনোহর করিয়া তোলে ইউরোপীয় romantic কাব্য কল্পনায় তাহারই অপূর্ব উৎসার দেখিতে পাওয়া যায়।' বিদ্যাপতির এই romanticism ইউরোপীয় লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহা ভারতীয় মিষ্টিক (mystic) অনুভূতির পর্যায়ভুক্ত। 'এই পদটিতে বৈষ্ণব প্রেম সাধনার মনোরম অতৃপ্তিজনিত পাওয়ারই আকুলতা আছে। প্রাণ যেন পাইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না— 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ তইও হিয় জুড়ল ন গেল।' ইহা খাঁটি mystic রসানুভূতির পরিচয় বহন করিতেছে।' *

একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এবং এমন তীব্র ও সুস্পষ্ট আত্মরতি চরিতার্থতার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়া দেহাতীত রূপরসধারার দিব্যমূর্তি এমন সুন্দরভাবে আর কোথাও ফুটিয়াছে কি না জানি না। বিদ্যাপতির এই গান দেহগত ভোগলালসার গান নয়। ইহা ভাবলোকের দেবলোকের গান। বিদ্যাপতি এই ভাব প্রকাশ করিতে যে রূপক ও উপমা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্বকালের সর্বমানবের কাছে এত পরিচিত যে, ইহা ব্যাখ্যা করিতে বা বুঝিয়া লইতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

বিদ্যাপতি কাব্যের ক্রমবিকাশ এই ভাবসম্মিলনে পৌঁছিয়াই পরিণতি লাভ করিয়াছে। কবি স্বভাবভীরু হরিণ শিশুর ন্যায় যে বালিকার মানবাত্মাকে লইয়া তাঁহার কাব্যহারে প্রথম ফুল গাঁথিয়াছিলেন তাঁহাকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া, কত দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় সিক্ত করিয়া, কত দুস্তর ও দুর্লঙ্ঘ্য পথ ডিঙাইয়া আনন্দের সাগর সঙ্গমে আনিয়া পৌঁছাইয়াছেন। কবি বিদ্যাপতির জীবনদর্শন এমনভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা মাধবের লীলা বর্ণনা করিয়াই আপনাদিগকে যশস্বী করিয়াছেন কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্য কোন কবি সেই বাঁধাধরা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র জীবনের বিবর্তন দেখাইতে পারেন নাই। সুখ

* মোহিতলাল মজুমদার : কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য (১ম খণ্ড), পৃ ৪-৮

দুঃখ বাধা বিপত্তি আছে বলিয়াই তো জীবন। যশোশিখরে আরোহণ করিতে গেলে তাহা একদিনে হয় না। সাধনার দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, আত্মশক্তির সাহায্যে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছিয়া থাকে। বিদ্যাপতি এই সত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। জীবনব্যাপী সাধনার এমন একটি পথ তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে পথে যুগ যুগ ধরিয়া আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠ মানুষ বিচরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই বিদ্যাপতির কাব্যে দেখি— যে শক্তি মানুষকে পদে পদে দিক ভুলায় তাহার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে রত হইয়া তাহাকে পরাজিত করিবার পথে যে রূপরস চতুর্দিকে উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিল, মর্ত্যমানুষকে তাহার ফল ভোগ করিতে দিয়া যে শক্তি অনন্তকাল ধরিয়া অমৃতলোকের অনাস্বাদিতপূর্ব রস অমৃতপুত্রদের জন্য ছড়াইয়া গেল 'বিদায়কালে কবির কাব্যলক্ষ্মী অতি সন্তর্পণে নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিয়াছে।' এইজন্য কবি বিদ্যাপতিকে চিরন্তন মানবাত্মার কবি বলিয়াছি। এইজন্যই 'বিদ্যাপতি চির নবীন চির মধুর' প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বিদ্যাপতির কাব্য এইখানেই শেষ হইয়াছে। ইহার পরে কবি যে সর্গের অবতারণা করিয়াছেন তাহা রাধিকার বা মানবাত্মার জন্য নহে। রাধিকার জবানীতে কবি শুধু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। সে প্রার্থনায় জীবন ও জগতের বাস্তব সত্য কিভাবে ধরা দিয়াছে, ধ্যান ও জ্ঞান, রূপ ও রস, বাস্তব ও কল্পনা, যুক্তি ও তর্ক, অর্থ ও পরমার্থ কবি বিদ্যাপতির আত্মাকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, অতঃপর তাহাই বলিব।

[পাঁচ]

বিদ্যাপতির প্রার্থনা

মানুষ কি সহজে প্রার্থনা করিতে চায়? আবার হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন হইলেই কি স্রষ্টার গুণগান করিতে সে তৎপর হয়? হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নাহয় জীবনব্যাপী স্বীয় কীর্তিকলাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া সে প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার মধ্যেই মানুষের সত্য সন্দর্শন ঘটে।

বিদ্যাপতি এমন কোন অন্যায় করেন নাই। যদি কিছু করিয়া থাকেন তবে তাহা মাধবকে নিতান্ত সাধারণ মানববুদ্ধিতে মানবাকৃতি দিয়া মর্ত্যজীবনের

মাধুরী পান করাইবার জন্য শ্রীরাধিকার সঙ্গে একহারে গাঁথিয়াছেন। বাল্য ও যুব জীবনের সকল কেলি, সকল বিশ্বাসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তাঁহার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। বিদ্যাপতির পৌরোহিত্যে সেই ভাগ্যবান ভগবানও 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে' যে আনন্দ পাইয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তিনিও বোধহয় তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন, কিন্তু গুণাতীতকে সগুণ করিয়া, লোকাতীতকে ভূলোকের মধ্যে আনিয়া, দেহাতীতকে দেহের বাঁধনে বাঁধিয়া, অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিয়া, সাধারণ মানবরূপে সর্বজনবোধগম্য করিয়া তুলিয়া তিনি যে পাপ করিয়া গেলেন, সেই পাপের জন্যই মহাভারতের কবির অন্তিম প্রার্থনার মত তাঁহাকেও প্রার্থনা করিতে শুনি—

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলি মিশি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥

এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥

যাবত জনম হাম তুয় পদ না সেবল
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

ভণই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি
কহলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয় পয় লাজে॥

আজীবন পাপ করিয়া যত নাম কিনিলাম—যত ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজনেরা মিলিয়া তাহা খাইল। কিন্তু মরণের সময়ে দেখি, কেহই আর জিজ্ঞাসা করে না—'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।' হায়! শুধু কর্মফলই সঙ্গে যাইতেছে। হরি হে, তোমার পদরূপ নৌকাকে বন্দনা করিতেছি, তোমার পদ পরিত্যাগ করিয়া, এ পাপ সংসারসমুদ্র কেমন করিয়া পার হইব?

আজীবন আমি যদি তোমাকে এত ছোট না করিয়া, বড় করিয়া গুণগান করিতাম, যদি যুবতীর দিকে মন না দিতাম, অমৃত অর্থাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ না করিতাম, তবে হয়ত আমার একটা উপায় হইত। কিন্তু আজ দেখি আমার সম্পদ অর্থাৎ আমার ক্ষমতা, আমার কবিত্বই আমার বিপত্তির একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাপতি তাই বলিতেছেন—'ভগবান! আমার প্রতি নিশ্চয় তোমার স্নেহ আছে; আমার কাছে ব্যক্ত করিলে হয়ত আমি আহ্লাদে আটখানা হইব, এই ভাবিয়া তুমি তাহা মনে মনে রাখিয়াছ। তুমি গুপ্তই রাখো আর ব্যক্তই করো, আমি জানি সন্ধ্যাবেলায় কেহ যদি অন্নভিক্ষা চায় সচ্ছল গৃহস্থ তাহাকে বিমুখ করিতে লজ্জাবোধ করে। আমি সেইরূপ আমার জীবন-সন্ধ্যায় তোমার চরণপদ্ম দেখিবার কামনা করিলাম, দেখি তুমি আমাকে কেমন করিয়া নিরাশ করো।' ইহা আত্মবিশ্বাসের প্রার্থনা।

বিদ্যাপতির যে পদটি এইবার উদ্ধৃত করিতেছি তাহা প্রার্থনাযোগ্য পদ বটে।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহরি বিশোয়াসা।
আধ জনম হাম নিন্দে গোমাওল
জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভণই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা।

সাগরতীরের উত্তপ্ত বেলাভূমিতে বারিবিন্দু যেমন পড়িবামাত্রই নিঃশেষ হইয়া যায়, হে ভগবান! তেমনি আমি তোমাকে ভুলিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবেষ্টিত সমাজ ও সংসারে ডুবিয়া গেলাম। হায়! এখন আমার এই জীবনসন্ধ্যায় কি হইবে! হে মাধব! আমার পরিণাম নৈরাশ্যজনক, কিন্তু আমি জানি, তুমি জগত্তারণ-কারী দীন দয়াময় হরি, অতএব তোমার প্রতিই আমার আশ্বাস। দেখো, আমাকে নিরাশ করিও না। অর্ধেক জীবন নির্ভাবনায় গায়ে বাতাস দিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। আর বহুদিন বাল্য ও জরাজনিত অজ্ঞতায় কাটিয়া গেল। বাকী অর্ধেক রমণী-রঙ্গরসে তাহাদের সঙ্গে হাসিখুসী ও কেলি-কোলাহলে এমন করিয়াই ডুবিলাম যে, তোমার কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। আজ তাই পাপ-জীবনের দুঃখ, জীবনসূর্যের অস্তগমন-ছায়ায় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। জীবনে যাহাই করি না কেন, আত্মবিশ্বাস হারাই নাই। কারণ, একথাও জানি, 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা; তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত; সাগর লহরি সমানা।' যেমন সাগরতরঙ্গ সাগরেই উদ্ভূত হয় আবার অনন্ত সাগরেই মিলাইয়া যায় তেমনি প্রতিদিন শত সহস্র জীবনতরঙ্গ তোমা হইতেই উদিত হইয়া তোমাতেই অস্তমিত হইতেছে। কিন্তু তোমার না আছে আদি, না আছে শেষ!

নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর চিরন্তন সত্য কবির অনুভূতিতে উছলিয়া উঠিয়াছে। জগতের পরম পিতা নানা ধর্মগ্রন্থে যে কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন কবির ভাষায় সেই চিরপুরাতন নিত্য নূতন বেদনার অশ্রুধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই পংক্তি দুইটি আবেশবিহ্বল চিত্তে যখন আওড়াইতে থাকি, তখন মনে পড়ে পবিত্র কোরআনের সেই কথা কয়টি—'মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম্, অ ফি'হা নুয়িদোকুম্, অ মিন্‌হা নুখ্‌রোজাকুম্ তা'রাতান্ ওখ্‌রা।' খোদা যে ধূলিকণা হইতে মানুষকে সৃষ্টি করেন, সেই ধূলিকণাকেই তাহার একমাত্র নিদান করিয়া সেইখানেই আবার যেভাবে সেই মানবদেহকে ফিরাইয়া লন তাহার মধ্যে আমরা সেই মহাসত্যেরই সন্ধান লাভ করিয়া থাকি 'আয় খোদাওন্দ্! তোমারই সৃষ্ট জীব আমরা, জীবনশেষে তোমাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব।'

জাগতিক মহাসত্যের অনুসন্ধান পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যেমন পাই, তেমনি বেদ বেদান্তে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের কবির জবানীতে সেই সত্যই ধৃত হইয়া

সকল কালের সকল দেশের মানুষের কাছে অমৃতরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই যখন শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই—

সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহংন মামকীনস্তম্
সামুদ্রিহি তরঙ্গঃ
ক্বচ ন সমুদ্রো নঃ তরঙ্গ।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, নাথ! আমি জানি আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ—তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তরঙ্গই সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে। তখনই পশ্চিমের মহাকবি শেলীর ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া এমন সঙ্গীত প্রবাহে এই সত্য কিভাবে আসিয়া ধরা দিয়াছে তাহা পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হই—

The one remains the many change and pass,
Heaven's light forever shines earth's shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of eternity.
Until death tramples it to fragments.—Die,
If thou wouldst be with that thou dost seek!
Follow where all is fled! Rome's azure sky,
flowers, ruins, statues, music, words are weak
The glory they transfuse with fitting truth to speak.

শেষটুকুর কি আর অর্থ করিব! ইহা তো কান্নার ভাষা। রহিয়া রহিয়া অনুতাপদগ্ধ বিদ্যাপতির ক্রন্দনমুখর গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে—'শেষ শমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নহি আরা।'—

ইহার পর বিদ্যাপতির কাব্য-পাঠশেষে বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ জনিত তাঁহার শেষ পদটি উদ্ধৃত করিতেছে ঃ—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়!
দয় তুলসী তিল দেহ সোঁপলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুঁহুঁ করবি বিচার।

তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবাহির নহি মঞি ছার ।।
কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ ।
করম বিপাকে গতাগত পুনু পুনু
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।।
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ।।

কবি বিদ্যাপতির কাব্যবিচার শেষ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রকাব্যের মুলসুর—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া ।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা ।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা ।

বিদ্যাপতির কাব্যে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' নাই। ইহা অরূপরতন আশা করিয়া রূপসাগরে ডুব দেওয়ার মতো। হিন্দু যেমন আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সাকার সাধনমার্গ অবলম্বন করিরা নিরাকার সাধনমার্গে উন্নীত হইবার দাবী রাখেন, বিদ্যাপতিও তেমনি বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনার দ্বারা ভাবলোকে বাধাহীন অভিসার করিয়াছেন। দেহের বাঁধনে দেহাতীতকে বাঁধিয়া সর্বশেষে তাহারই চরণতলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় দেখি উভয় কবির জীবন ও কাব্যাদর্শে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, এমনকি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তুলনাও চলে না ; তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় কাব্যসাধনার প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া উভয় কবির বীণা যেন একইভাবে একই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।*

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদগুলি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী' (বসুমতী সংস্করণ ; দ্বিতীয় ভাগ) হইতে গৃহীত।